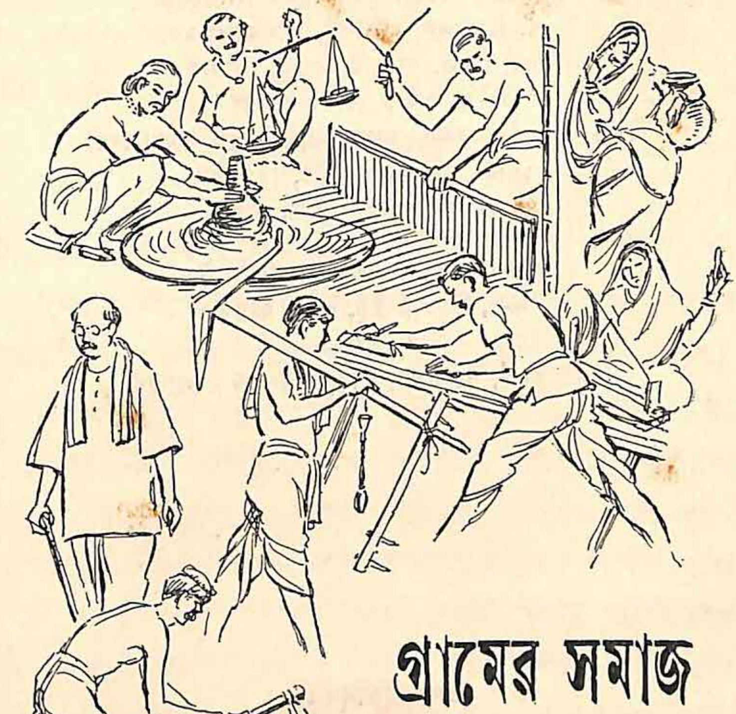
গ্রামের সমাজ





গ্রামের সমাজ

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই ১
৩৬-এ, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
২৪।১, ক্যানসন হাউস, আসফ আলী রোড, নতুন দিল্লী
১৭।৬০, সন্ন্যাসীরাজু ষ্ট্রীট, বিজয়বাদ
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭, ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীট্, লণ্ডন, ডব্লিউ ১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরোণ্টো, কেপ টাউন ও মেলবোর্ণ

প্রথ ... ৫৬

মুদ্রাকর
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রামের সমাজ

১। সমাজ কথাটার মানে কি ?

যেখানে কয়েকঘর লোক বাস করে সেইখানেই হয় সকলের সাথে একটা সহজ মেলামেশা। এই মেলামেশার থেকেই জন্মায় ভালবাসা। এক ঘরের লোক অন্য দু'-একটা ঘরের লোকদের একটু পছন্দ করে। রীতিমত তাদের খোঁজ খবর নেয়। বিপদে-আপদে সাহায্য করে। আনন্দের সাথী হয়। পূজো-পার্বন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ—এই সব ব্যাপারে একে অন্যের জন্যে খাটে। কোন কোন ঘরের আবার সকল ঘরের সঙ্গেই বেশ মিল থাকে। অবশ্যি এমন দু' একটা ঘরও দেখা যায় যাদের সঙ্গে কারুর বড় একটা মিল থাকে না। তবে সকল বিষয়ে একেবারেই গরমিল থাকে তাও বলা যায় না। এই একে অন্যের উপর নির্ভর করে চলা এবং মিলেমিশে থাকার ফলেই গড়ে উঠে সমাজ। সকল গ্রামেই কয়েক ঘর লোক এই ভাবে মিলেমিশে থাকে। তাই সকল গ্রামেই একটা করে সমাজ আছে।

২। কাদের নিয়ে সমাজ ?

গ্রামে যাদের জমি-জমা আছে, যারা ব্যবসা করেন, যারা হাতের কাজ করেন, আর যারা জনমজুর খাটেন তাদের নিয়েই গ্রামের সমাজ গড়ে উঠেছে। যাঁরা বড় চাকুরী করেন,

যাঁরা ছোটখাট চাকুরী করেন, যাঁরা কল কারখানায় কাজ করার জন্যে শহরে থাকেন, আর যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁরা এই সমাজের লোক হলেও এই সমাজের বাইরে। তার কারণ তাঁরা গ্রামের সুখ-দুঃখের ভাগী নন। যাঁরা গ্রামে সর্বদা বাস করেন তাঁরা হ'চ্ছেন চাষী, তাঁতী, দরজী, রাজমিস্ত্রী, কুমোর, ছুতোর, ঘরামী, জেলে, জন-মজুর, মুদিখানার মালিক ও কর্মচারী। তাছাড়া সেখানে আছেন কয়েকজন শিক্ষিত লোক। তাঁদের কেউ জমি-জমার মালিক, কেউ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কেউ বা ডাক্তার অথবা কবিরাজ। এদের নিয়েই গ্রামের সমাজ। নিজেদের অবস্থা যেমন, অথবা শক্তি যতটুকু তার দ্বারা এরা সমাজের জন্যে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। তবে যার যতটুকু কাজ তা ঠিক্ ঠিক্ মত সকলে করেন না বলেই যত গোল।

৩। গ্রামের সমাজে কিসের অভাব?

গ্রামের ছোট বড়র পার্থক্য অনেকটা কমে এসেছে। ছোঁয়া-ছুঁয়ি, জাত-বিচারের বালাই বিশেষ নেই। তবে একেবারে দূর হয়েছে তা বলা যায় না। নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে গ্রামকে ভালবাসতে আমরা শিখিনি। নিজের জমি-জমা সম্পত্তির স্বার্থ এখনো আমাদের কাছে বেশি বড়। বড় জাত ছোট জাতের কথা এখনো আমাদের মন থেকে যায়নি। নিজের জমির খানিকটা সকলেই সুবিধের জন্যে ছেড়ে দেওয়ার মত উদার মন আমাদের এখনো হয়নি। এখনো আমরা নিজেদের বাঁশ ঝাড়কে জিইয়ে রেখে পাশের বাড়ির লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করি। গরিব ও পয়সা ওয়ালাদের মধ্যে এখনো আছে বাধার মস্ত বড় দেওয়াল।

এখনো গ্রামের লোকের রুচির পরিবর্তন হয়নি। তাই এখনো আমাদের গ্রামে বেড়ে উঠ্‌ছে ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। লেখাপড়ার মূল্য সবাই বোঝেনা। মিলেমিশে কাজ করবার অভ্যাস এখনো জন্মায়নি। এখনো অনেকে নেশা করে, জুয়া খেলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে এখনো সবাই শেখেনি। খুব কম খরচায়ও কাপড় জামা পরিস্কার করা যায় একথা অনেকেই বোঝে না। স্বাস্থ্যের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি অনেকেরই জানা নেই। টিকে কেউ দিতে চায় না। পানীয় জল সম্বন্ধে অনেকেই সাবধান হয় না। চাষের কাজে এখনো লোকের মন বসে না। কি করে বেশি ফসল পাওয়া যায় সে কথা কজন ভাবে? গ্রামের আশে পাশে—এমনকি ভিতরেও ডোবাগুলো হয়ে আছে মশার ডিপো। গ্রামে খেলার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আর যদি বা থেকে থাকে তাতে হচ্ছে শুধু ঝগড়ার সৃষ্টি। এখনো দেখি হাজা-মজা পুকুর কেচকর ভর্তি অসমান রাস্তা আর মজে-যাওয়া খাল। রাস্তার পাশে দেখি বন-বাদাড়, সাপের গর্ত। বাড়ির আনাচে কানাচে বেড়ে উঠেছে আবর্জনার পাহাড়। স্বাধীন দেশে পল্লী-মার এই দুর্দশা!

আর সমাজও কি গ্রামে একটা? যতটা জাত প্রায় ততটাই সেখানে সমাজ। যেখানে পঁচিশ ঘর লোকের বাস সেখানেও সমাজ আছে অন্ততঃ পাঁচটা। এরা নিজেদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবে। গোটা গ্রামের ভাল-মন্দর ধার তারা ধারে না। এই কি আমাদের সমাজ? যার জন্যে আমাদের পরাধীনতা, স্বাধীন হবার পরেও আমরা সেই পাপকে আঁকড়ে রেখেছি? এত ভাল লক্ষণ নয়! যাঁরা বিদেশে থাকেন, তাঁরাও পয়সাওয়ালা লোক

হয়েও নিজের গ্রামের দিকে ফিরেও তাকাননা। কেউ দেশ কোথায় জান্‌তে চাইলে বলেন হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান কি মেদিনীপুর, অথচ গেল দশ বছরের মধ্যেও তাঁদের সেখানে যাওয়া হয়নি। তাঁদের বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। ঝালাইয়ের অভাবে পুকুরগুলো গেছে মজে। ছোপ-ঝাড়, জঙ্গলে বাড়িটি তাঁদের হয়ে উঠেছে খেঁকশেয়ালী ও সাপ-খোপের বাসা। তাঁরা হয় সেখানে যান টাকা পয়সা আদায় করতে, নয়ত একেবারেই যাননা। দেশের মাটির প্রতি এই অনাদরের জন্যেই বেড়ে উঠেছে গ্রামের সকল রকমের অসুবিধে। যাঁরা যথেষ্ট রোজগার করেন তাঁরা যদি গ্রামে গিয়ে লোকের সুখ-দুঃখের খবর নিয়ে আসতেন, গ্রামের সুখ-সুবিধার জন্যে একটু খাটতেন, তবে গ্রামের চেহারা এমন থাকত না।

গ্রামে যদি যথেষ্ট রোজগারের পথ খোলা থাক্‌ত। নিজের নিজের আয়ে যদি পরিবার প্রতিপালন করা যেত, তাহলে লোকের লেখাপড়া শিখবারও শেখাবার উৎসাহ দেখ্‌তে পাওয়া যেত। ছেলেকে ইস্কুলে না পাঠিয়ে, চাষের কাজে বা গরু চরানোতে লাগিয়ে দিতে পারলে সুবিধে দেখ্‌তে পাওয়া যায় বেশি। ছেলে কবে লেখাপড়া শিখবে, কবে বড় হবে—তদ্দিন তাকে খাওয়াবে কে?

আর মেয়েদের কথা ত ছেড়েই দিলাম। মেয়ে ঘর-কন্নার কাজ-কর্ম শিখবে। বড় হলে তার বিয়ে হবে। লেখাপড়াটা লাগবে কোথায়? রাতদিন ত হেঁসেলেই থাকতে হবে। ঘরকন্নার কাজেও যে লেখাপড়ার দরকার আছে তা আর কজন বোঝে?

আজকাল সরকারের চেষ্টায় এই সব অভাব খানিকটা দূর হয়েছে। তবু গ্রামগুলিকে ভাল করে তূলতে হলে আরও অনেক চেষ্টার দরকার। কি ভাবে এবং কতটা আমাদের গ্রামের জন্যে খাটতে হবে পরের পর সেই বিষয়েই বলা হচ্ছে।

৪। এই মিইয়ে পড়া সমাজের উন্নতি কি করে হতে পারে?

(ক) বালক-বালিকা ও স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা।

কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে লেখাপড়া শেখবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। বিশেষ করে গ্রামের লোকের লেখাপড়ার কথা কেউ ভাবত না। যখন এর জন্যে একটু আধটু সরকারী চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল তখন দেখা গেছে যে গ্রামের লোকের এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ নেই। আগ্রহ না হবার দুটো কারণ ছিল! একটা কারণ হল এই যে শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা এই সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ দিতে পারেন নি। আর একটা কারণ হল যে তখন ছেলে-মেয়েদের চাষের কাজ ও বাড়ির কাজে লাগানোটাই বেশি দরকারী বলে অভিভাবকরা মনে করতেন। যাদের ইস্কুলে পাঠান হত তাদেরও কিছুদিন পরেই আর যেতে দেওয়া হত না। এইভাবে গ্রামের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই অশিক্ষিত থেকে যেত।

এখন অবশ্যি আর সেদিন নেই। নানাভাবে সরকার প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে চেষ্টা করছেন। তাই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি খানিকটা দূরে দূরেই একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর এই সমস্ত বিদ্যালয়েরই কোন কোনটিকে করা হয়েছে বয়স্ক-শিক্ষার কেন্দ্র।

এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। তাদের মাইনে দিতে হয় না। এখনো অবশ্যি এই শিক্ষা নিতে সকলকে বাধ্য করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশা করা যায় শিগ্‌গিরই গ্রামের সকল ছেলে-মেয়েদেরই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে নতুন ধরণের ইস্কুল করা হয়েছে। এই সমস্ত ইস্কুলে আছে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে হাতের কাজ ও খেলার ভেতর দিয়ে গ্রামের বালক-বালিকারা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া শিখ্‌ছে। গ্রামের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে রাত্তিরবেলা অনেক অভিভাবক জড় হচ্ছেন। সেখানে চলছে খবরের কাগজ পড়ে শেখানো, রেডিও সেটের সাহায্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান জন্মানো এবং আনন্দ দেওয়া। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে মাঝে মাঝে তাঁদের স্বাস্থ্য ও চাষের বিষয়ে নানা দরকারী কথা শোনানো হচ্ছে।

সেই জন্যেই বলছি আগেকার অবস্থা এখন আর নেই। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে যতই চেষ্টা করুননা কেন গ্রামের সমাজের লোকদেরও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কর্তব্য আছে। এখনো গ্রামের সকল ছেলে ইস্কুলে যায় না। মেয়েদের শিক্ষার মূল্য এখনো সকলে বোঝেনা। কাজেই গ্রামের লোকদের মনের ভাবটাকে বদলাতে হবে। গ্রামের সমাজের এর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এই ভাবেই শিক্ষার দিক থেকে আমরা সকল দেশের সমান হতে পারব।

(খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা
শিশু মহল এবং প্রসূতির যত্ন

গ্রামে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার মূল্য খুব কম লোকেই বোঝে। অনেকে বলেন পয়সার অভাব তাই গ্রামের লোক

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না। একথাটা কোন কোন লোকের বেলায় সত্যি হতে পারে, কিন্তু সকল লোকের বেলায় নয়। নিতান্ত গরিব ছাড়া আর সবাই ঘর দোর, কাপড়-চোপড় পরিস্কার রাখ্‌তে পারেন। সেটা অবস্থার দোষ নয়—ইচ্ছার অভাব। যেখানে চার পয়সার সোডা কিন্‌লে দু'তিন খানা কাপড় কেঁচে নেওয়া যায়, সেখানে কাপড়, জামা, গেঞ্জি, বিছানা অত ময়লা থাক্‌বে কেন? এর কারণ আমরা খাট্‌তে রাজী নই।

বাড়ির আশে-পাশের জঙ্গল বেড়েই চলে। এমন কি দুর্বা-ঘাসের মধ্যে দিয়েও পথ চলা দায়। বাড়ির চারধারে আমরা জমিয়ে রাখি আবর্জনা। মাছের কাটা, তরকারীর খোসা, উনুনের ছাই—এইসব মিলে হয়ে ওঠে একটা নরক। পথ চল্‌তে অসুবিধে হবে, বিশ্রী গন্ধ বেরুবে, তবু আমরা এইসব জঙ্গল ও আবর্জনা বাড়িয়ে তুল্‌ব। সাপের কামড়ে লোক মরবে, তবু আমাদের চৈতন্য হবে না।

আর স্বাস্থ্যের কথা ত খুব কম লোকই জানে। তাই খুব কম লোকই এ সম্বন্ধে ভাবে। ঘুম থেকে উঠে পায়খানায় যাওয়া, দাঁত মেজে মুখ চোখ ভাল করে ধোয়া, মাঝে মাঝে গায়ে সাবান দেওয়া, হপ্তায় একদিন সাবান দিয়ে মাথা রগড়ান। মাঝে মাঝে চুল ছাটিয়ে নেওয়া, নখ কাটা—এসব নিয়ম কজনই বা মেনে চলে?

আশে-পাশের খানা ডোবাগুলো হয়ে ওঠে মশার ডিপো। সেগুলোকে ভরাট করে না দিলে ম্যালেরিয়া কিছুতেই কমবেনা। এই ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দিনের পর দিন কত লোক মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু গ্রামের সমাজের ঘুম ভাঙ্গেনি।

তাছাড়া গ্রামে ওলাউঠা, ও বসন্ত আরম্ভ হলে ত কথাই নেই।

বসন্তের ও কলেরার টিকে সবাই নিতে চায় না। অনেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে। অথচ এই টিকে নেওয়া থাকলে বসন্ত ও কলেরা হলেও রোগী বেঁচে যায়। সরকারী খরচায় যখন এই টিকের ব্যবস্থা করা হয়, তখনো সমাজ তার কর্তব্যে অবহেলা করে।

গ্রামের সমাজের যারা প্রধান তাঁদের উচিত সকলকে টিকে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা যে খুবই সহজ এবং বিনা পয়সায় একটা ভাল রকমের কাজ পাওয়া যাচ্ছে এইটি সকলকে বুঝিয়ে দেওয়াই সমাজের কাজ।

আমাদের গরিব দেশে খাবার জিনিষের খুবই অভাব। পুষ্টিকর খাদ্য ত দূরের কথা, মোটামুটি পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থাও অনেকের বাড়িতেই নেই। অথচ এই অল্প পয়সার ভেতরেই আমাদের এমন দু'একটা জিনিষ রোজ খেতে হবে যাতে খাদ্য-প্রাণ বা ভিটামিন থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ফল, তাজা শাক সব্জী, ছোলা—এই সব জিনিষের কিছু না কিছু খেতে না পারলে দিনের পর দিন আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাদের খাটবার শক্তি কমে যায়। রীতিমত সার ও জল না পেলে, গাছ যেমন বাড়তে পারে না, গাছের ফলন যেমন কমে যায়, আমাদের বেলায়ও তাই হয়। সুতরাং শরীর ভাল রাখার এই উপায়টা সমাজের কর্তারা সকলকে জানাবেন এবং মনে করিয়ে দেবেন।

এই ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে গ্রামের লোক চর্মরোগের

হাত থেকে, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে এবং কলেরা ও বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে শরীর সুস্থ ও সবল রাখবে।

শিশুর মঙ্গল অর্থাৎ শিশুর জন্ম যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে এবং শিশুর জন্মের পর, শিশুর এবং প্রসূতির যাতে যত্ন হয় গ্রামের সমাজ গৃহস্থদের সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। দুর্বল প্রসূতি ও সন্তানের দল জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দেয়। এ সম্বন্ধে গ্রামের সমাজের বিশেষ সতর্ক হতে হবে।

(গ) আঘাত বা দুর্ঘটনার প্রথম চিকিৎসা, টিকে দেওয়া, রোগীর সেবা, পানীয় জল ও পাইখানা

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটি দরকারী জিনিষ জানা দরকার। তার মধ্যে সব চাইতে বেশি দরকার আঘাত ও দুর্ঘটনার চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান। কোন বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ডাক্তার আসতে সাধারণতঃ একটু দেরাই হয়। কারণ গ্রামে ডাক্তার, কবরেজের সংখ্যা খুবই কম। তারা ভিন্‌গাঁয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলে অনেক সময় অনেক অসুবিধার স্থষ্টি হয়। অনেক সময় ডাক্তার আস্‌তে দেরী হলে, প্রথম চেষ্টাটা আমরাই করতে পারি। যেমন সাপে কামড়ালে, কি সাপ কামড়েছে তার বিচার না করে চট্‌পট্‌ দুটো তিনটে রুমাল বা কাপড়ের টুক্‌রো বা দড়ি দিয়ে যেখানটায় কামড়ায় তার খানিকটা দূরে দূরে দু' তিনটে জায়গায় খুব শক্ত করে বাঁধতে হয়। তারপর ডাক্তার বদ্যি ডাক্‌তে হয়। না বেঁধে ডাক্তারের জন্যে ছুটোছুটি করতে করতেই রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে।

সাপ সাধারণতঃ পায়ে বা হাতেই কামড়ায়। মাথায় কামড়ালে, বা কোমর থেকে আরম্ভ করে গলা পর্য্যন্ত যে কোন জায়গায় কামড়ালে অবস্থা গুরুতর হয়।

এই রকম দুর্ঘটনায় সমাজের লোকের সাহায্যের দরকার। অনেক সময়েই বাড়ির লোকের মাথা গুলিয়ে যায়। সেইজন্যেই চীৎকার চেঁচামেচি শুনে পড়শীদের এগিয়ে যেতে হয়। এটা গাঁয়ের লোকের সামাজিক কর্তব্য।

তারপর ধরা যাক অজ্ঞান হয়ে পড়বার চিকিৎসার কথা। যখন যে কোন কারণেই কেউ অজ্ঞান হ'ক তার মাথায় তখুনি জল ঢালতে হবে, চোখে মুখে জল ছিটোতে হবে এবং খুব জোরে জোরে হাওয়া করতে হবে।

এই সব ব্যাপারেও সমাজের লোকদের এগিয়ে যেতে হবে।

তারপর আস্‌ছে হঠাৎ জামা-কাপড়ে আগুন লেগে যাওয়ার কথা। অনেক সময় পিদিমের আলো থেকে চট্‌ করে জামা-কাপড়ে আগুন লেগে যায়। অনেকে কি করতে হবে বুঝতে না পেরে গায়ে মাথায় জল ঢাল্‌তে আরম্ভ করে। সে রকম করলে বিপদকে বাড়িয়ে তোলা হয়। এতে সারা গায়ে ঘা হয়ে যায় এবং রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এই রকম ঘটনা ঘট্‌লে তখুনি সেই লোকটাকে একটা মোটা কম্বল বা চট্‌ দিয়ে চেপে ধরতে হয়। তাতেই আগুনের জোর কমে যায় এবং নিবেও যায়।

গ্রামের সাধারণ লোকদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া গ্রামের সমাজের একটা বড় রকমের কর্তব্য। কারণ ডাক্তার আসবার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

টিকে দেওয়া সম্বন্ধে আগেই একবার বলা হয়েছে। দুরকম অসুখের জন্য সাধারণতঃ টিকে দেওয়া হয়। একরকম টিকে দেওয়া হয় বসন্ত রোগ নিবারণ করবার জন্যে আর একরকম টিকে দেওয়া হয় কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। এ ছাড়া আরও দু'রকমের টিকের ব্যবস্থা আছে। তবে সেগুলির খুব বেশি প্রচলন নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে টাইফয়েডের টিকে। সেটা একরকমের কলেরারই টিকে, তবে সেটা টাইফয়েড ও কলেরা দুইই নিবারণ করবার শক্তি রাখে। এর ডাক্তারি নাম হচ্ছে টি, এ, বি, সি। আর ক্ষয়রোগের টিকেকে বলে বি, সি, জি।

এইসব টিকে যে গ্রামের লোকদের প্রাণরক্ষার কত বড় অস্ত্র তা গ্রামের লোকদের শিখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সমাজের যারা শ্রেষ্ঠ তাঁদের।

তারপর আস্‌ছে রোগীর সেবার কথা। কোন ব্যাপারেই সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলেনা। এ ব্যাপারে ত একেবারেই নয়।

এটি একটি খুব উঁচুদরের সমাজসেবা। অনেক রোগে ওষুধ খাওয়ানোর চাইতে রোগীর সেবারই দরকার হয় বেশি। হয়ত কোন কোন গ্রামে রোগীর সেবার দিক থেকে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। তবে হলেও খুব ভালভাবে হচ্ছেনা। নিজের সুখ-সুবিধা বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে রাত্তির জেগে একমনে রোগীর সেবা করা খুবই কঠিন কাজ। রোগীর সেবা একটা সাধনা। এতে খুব ধৈর্য্যের দরকার। চঞ্চল লোক কখনো রোগীর সেবা ভালভাবে করতে পারে না। অনেক বাড়িতে স্ত্রী-পুরুষ দু'একটি

থাকেন যারা রোগীর সেবার অনেক নিয়ম জানেন এলং ভালভাবে এ কাজটা করতে পারেন। কিন্তু অনেক বাড়িতেই রোগীর সেবা ভাল হয় না।

সেইজন্যেই গ্রামের সমাজের এ সম্বন্ধে ভাব্‌তে হবে এবং



রোগীর সেবায় যুবকদল

অসুখ-বিসুখে রাত-জেগে রোগীর সেবা করতে পারে এমন একটি যুবকদল গড়ে তুল্‌তে হবে। এই সকল যুবকের চরিত্র খুব ভাল হবে। তাদের কুসঙ্গী থাক্‌বেনা। তারা কোন নেশা করবেনা। শুধু রোগীর সেবায় নয়, তারা লোকের সকলরকম

আপদে-বিপদে ছুটে যাবে। তাদের একটা সমিতি থাক্‌বে। সেই সমিতির সভায় তাদের কাজের ধারা ঠিক্ করে দেওয়া হবে। এই সমিতির একটা আপিসও থাক্‌বে। গাঁয়ের কয়েকজন ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য হবেন এবং তাদের মধ্যেই একজন হবেন সম্পাদক। এই সমিতির যুবকরা তাদের লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন করবার শিক্ষা নেবে।

তারপর আস্‌ছে খাবার জলের কথা। এ সম্বন্ধে এখন আর বলবার মত তেমন কিছুই নেই। তবু বলি যেখানে টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যাবে সেখানে সবাইকে পুকুর বা নদীর জল ফুটিয়ে খেতে শেখাতে হবে। ভাল খাবার জলের জন্যে কল্‌সী পর পর সাজিয়ে তার তলায় ফুটো করে এক রকমের দিশি ফিল্টার আমরা তৈরী করে নিতে পারি। বিলিতী ফিল্‌টারের মধ্যে বার্কফিল্ড ফিল্টার ভাল। তবে অত-শত গেরস্ত বাড়িতে হয়ে উঠ্‌বেনা। তাই জল যদি নলকূপ বা টিউবওয়েলের না হয়, তবে জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হবে। পুকুরের জলে পটাসিয়াম পারমেঙ্গানেট্ ছড়িয়ে দিলে জলের ভিতরকার বীজানু মরে যাবে। পুকুরের আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল আগাছা পরিষ্কার করে ফেল্‌তে হবে।

গ্রামের টিউবওয়েলগুলো যাতে সহজে খারাপ হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা গ্রামের প্রত্যেকটি লোকেরই কর্তব্য। এগুলো খারাপ হয়ে গেলে যাতে যখন তখন সারিয়া নেবার ব্যবস্থা গ্রামেই হতে পারে সেরকম ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। কারণ এই টিউবওয়েলগুলো হচ্ছে গ্রামের লোকের প্রাণ। গ্রামের সমাজের যারা প্রধান তাঁদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে।

দরকার হলে নিজেদের বাড়ি থেকেও সবাইকে জল নিতে দিতে হবে। শহর থেকে মিস্ত্রী আসবে, তবে কল ঠিক্ হবে তবে সবাই জল পাবে এমন যেন না হয়। তাছাড়া প্রত্যেক গ্রামে একটা বা দুটো এমন পুকুর থাকা চাই, যাতে কেউ নাইবেনা, কাপড় কাচবেনা, বাসন মাজবেনা বা আবর্জনা ফেলবেনা। সে পুকুরগুলো থাকবে একেবারেই খাবার জলের পুকুর।

এখন আমরা একটা খুব দরকারী জিনিষের কথা আলোচনা করব। এদিকে গ্রামের অধিকাংশ লোকের এখনো দৃষ্টি পড়েনি। এটি হচ্ছে পাইখানার কথা। রাস্তার পাশে, ক্ষেতের আলিতে, বাড়ির আনাচে-কানাচে পাইখানা করা খুবই খারাপ অভ্যাস। এটা দেখ্‌তে যেমন খারাপ, কাজেও তেমনি।

এখানে-সেখানে পাইখানায় বসলে যেমন সাপ-খোপের ভয় থাকে তেমন হয় রোগের সৃষ্টি। এই সমস্ত মল থেকেই, অথবা এই সমস্ত নোংরা জায়গায়ই হুকওয়ার্ম বা বক্র কীটের সৃষ্টি হয়। এগুলো অজান্তে পায়ের তলায় ছোট্ট ফুটো করে মানুষের শরীরে ঢুকে যায় এবং ধীরে ধীরে তাকে মেরে ফেলে।

তাই পাইখানার কথাটাও গ্রামের জীবনের একটা বড় কথা। যাদের পয়সা আছে তারা সহজেই সেফ্‌টি ট্যাঙ্ক পাইখানা করিয়ে নিতে পারেন। আর যাদের সে সুবিধে নেই, তাদের নিজের নিজের বাড়ির পেছন দিকটায় খানিকটা জায়গাত আছে? সেই খানেই তারা একটানা একটা লম্বা গর্তের মত করে দুদিককার মাটি দুপাশেই জমা করে রাখবেন। একজন পাইখানা করে যাওয়ার পরই যেখানটায় পাইখানা করা হয়েছে, দু'পাশের মাটি সরিয়ে সেই জায়গাটায় ফেলে দিতে

হবে। এই ভাবে কিছুদিন পাইখানার কাজ চলবে! তারপর অন্য একটা ঐ রকম গর্ত করে ঠিক্ করে নিতে হবে। এই হচ্ছে বিনা পয়সার ভাল পাইখানা।

গ্রামের সম্বন্ধের লোকেরা এই ব্যাপারে একটু আন্দোলন এবং আলাপ-আলোচনা করলেই গ্রামে এই রকম পাইখানার প্রচলন হবে।

(ঘ) রাস্তাঘাট তৈরী, খাল কাটানো, জঙ্গল পরিষ্কার ও কচুরীপানার নাশ

সরকারী চেষ্টায় এবং খরচায় আজকাল রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবু গ্রামে এমন অনেক রাস্তা আছে যা সামান্য মেরামত করলেই লোকের চলা ফেরার আর তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু এ ব্যাপারে গ্রামের সমাজের কোনও গরজ নেই। গ্রামের জন্যে সব কিছুই সরকার করে দেবে এ আশায় বসে থাক্‌লে এই সব অসুবিধা কিছুতেই দূর হবে না। অনেক সময় দেখা গেছে রাস্তার পাশে জল দাঁড়ানোর দরুন রাস্তা থেকে খানিকটা দূরের কয়েকটা বাড়িতে যাওয়া বড় কষ্টকর। সে সব বাড়ির লোকদের জলের ভিতর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। আমি দেখেছি ৪০টি লোক এক ঘণ্টা কাজ করে ঐ রাস্তা থেকে বাড়িগুলো পর্য্যন্ত একটা রাস্তা করে ফেলেছে। অথচ কারুর তেমন পরিশ্রম হয়নি। এই রকম ছোটখাট অথচ দরকারী কয়েকটি রাস্তা গ্রামের সমাজ সহজেই তৈরী করতে পারেন।

খাল বালিতে ভর্তি হয়ে গেলেও গ্রামের লোকেরাই

মোটামুটি ঝালাই করে নিতে পারেন। কে কতটুকু করবেন, কার দায়িত্ব কতটুকু একথা ভাবলে খালটি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ একটি খাল গ্রামের একটি সম্পত্তি। খালটি চালু রাখতে পারলে চাষের কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য ও কখনো



রাস্তাঘাট তৈয়ারী

কখনো যাতায়াতেরও সুবিধা হয়। গ্রামের জন্য এই মমতাটুকু জন্মানো চাই।

এ ছাড়া গ্রামে থাকে কতগুলো রাস্তা যেগুলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় সন্ধ্যের পর এসব রাস্তায় নেকড়ে বাঘও দেখতে পাওয়া যায়। সাপের ত কথাই নেই। জঙ্গলটি নিতান্ত অকেজো চারা গাছে ভর্তি।

ইচ্ছে করলেই কেটে ফেলা যেতে পারে। অথচ সকলেই অসুবিধা ভোগ করলেও কেউ এগিয়ে যায় না এই জঙ্গল কেটে পরিস্কার করতে। রাস্তাটির আশে-পাশের জমি যারই হোক না কেন তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দরকার হলে সবাই মিলে গিয়ে জঙ্গলা গাছগুলো কেটে ফেলতেই হবে। গ্রামের একটি লোকের খামখেয়ালী স্বভাবের জন্যে গোটা গ্রামের লোক ভুগ্‌বে কেন ? এই ভাবে রাত-বিরুতে দরকার হলে সেই পথে যাতায়াত করা চলবে। এ রকম একটা কর্তব্য কাজে গ্রামের লোক কিছুতেই পেছ্‌পা হতে পারে না। জঙ্গলাগাছগুলো কেটে, মালিক যদি চায় তাঁকে দিতে হবে নয়ত গরিব-দুঃখাদের দিয়ে দিতে হবে। তারা ওগুলোকে শুকিয়ে জ্বালানী করবে। গ্রামের ছেলেরা রাস্তার বা পুকুরের আশেপাশে জঙ্গলা গাছ বা পাতা জমে থাক্‌তে বা পচতে দেবে না।

তারপর আস্‌ছে কচুরীপানার কথা। যেখানে এ উৎপাত বেশি নেই সেখানে এ সম্বন্ধে কিছু করবার নেই, কিন্তু যেখানে আছে, সেখানে সকলে এক জোট হয়ে এই পানাকে ধ্বংশ করতে হবে। পুকুর বা খাল থেকে এইগুলোকে তুলে ডাঙায় ফেল্‌তে হবে। শুন্‌তে পাই এগুলো পাকলে এ থেকে এক রকমের সার তৈরী হয়। তা হলে এগুলো চাষের কাজেও লাগান যেতে পারে। এরা মরেই তাহলে গ্রামের লোকের উপকার করবে, আর বেঁচে থাক্‌লে করবে সর্বনাশ।

এই সব কথা যদি সকলের মনে থাকে এবং এই ভাবে যদি সকলে কাজ করে যান, তা হলে গ্রামের চেহারা পাল্টে যাবে। সেই জন্যেই বলছি গোটা গ্রামটাকেই নিজের বাড়ি এবং নিজের

ঘর বলে মনে করতে হবে, এই ভাবেই প্রত্যেকটি গ্রাম হয়ে উঠবে এক একটি আদর্শ পল্লী। সেই শুভদিন বোধ হয় বেশি দূরে নেই !

(ঙ) চাষের কাজে উন্নতির চেষ্টা

চাষের সম্বন্ধে এত কথা বলা হয়েছে এবং শোনা গেছে যে এ সম্বন্ধে নতুন করে বেশি কিছু বলবার নেই। তবু এ বিষয়ে গ্রামের সমাজের প্রধানদের লক্ষ্য করে দু' একটা কথা বলা দরকার।

চাষের উন্নতির জন্য সরকারের চেষ্টার ত্রুটী নেই। কিন্তু সরকার যাই করুন এবং যতটাই করুন গ্রামের সমাজের লোকদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাববার এবং করবার আছে। কারণ চাষের উন্নতিতেই গ্রামের উন্নতি। ভাল চাষের কাজের জন্যে সরকার এখন উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এতে অবিশ্যি যথেষ্ট কাজ হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সমাজের দায়িত্ব কম নয়।

যে সব ক্ষেত্রে চাষীদের নিজের ভাল বলদ ও লাঙ্গল নেই সেখানে অনায়াসেই কয়েকজন চাষী মিলে এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন। এই রকম মিলে মিশে চাষকরার নামই সমবায় পদ্ধতি। এ কথাটা আজকাল অনেকেই শুনতে পান। সেই জন্যে আলাদা ভাবে এর আলোচনা করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। জলসেচ, সার তৈরী, ফসল বিক্রী এসব ব্যাপারেও মিলে মিশে কাজ করা যায়।

একদল চাষী অপর দলের চাইতে ভাল ফসল ফলবে এই রকম একটা প্রতিযোগিতার ভাব খুব ভাল। এটা ঝগড়া নয়।

শুধু নিজের কাজকে যতটা সম্ভব ভাল করবার চেষ্টা। তুলনায় এবং প্রতিযোগিতায় খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। শুধু এই ব্যাপারে নয়। খেলাধূলা, পড়াশুনা সকল ব্যাপারেই এই প্রতিযোগিতার মূল্য খুব বেশি। সুতরাং চাষের ব্যাপারে পাড়ায় পাড়ায় এই ধরণের প্রতিযোগিতায় গ্রামের সমাজের খুব উপকার হতে পারে।

গ্রামের সমাজের লোকদের জমির সারের সম্বন্ধেও দু'একটা কথা বলা ভাল। অবিশ্যি সার সম্বন্ধে আজকাল অনেক কথা শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। গোবরের সার আমাদের খুবই পরিচিত সার। কিন্তু গ্রামের চাষী ভাইরা আর একটা কাজও করতে পারেন। তাঁরা যে সব তরকারীর খোসা, ডাটা, পাতা যেখানে সেখানে ফেলে দেন তা না দিয়ে তারা অনায়াসে একটা বড় গর্ত করে সেখানে এগুলো জমিয়ে রাখতে পারেন। যখন গর্তটা ভরে আসবে তখন মাটি দিয়ে গর্তটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। এই ভাবে ৩।৪ মাস যদি এগুলো মাটির নীচে পচে তাহলে একরকম ভাল সার তৈরী হয়। একে বলে কাম্পাষ্ট সার। এই সার সব্জী ইত্যাদির পক্ষে খুব ভাল। ৩।৪ মাস পরে সেই খানটায় মাটি খুড়লেই এই সারটা পাওয়া যাবে। অথচ বাইরে পড়ে পচে এগুলো শুধু আবর্জনারই সৃষ্টি করত।

তাই বলি গ্রামের সমাজের এখনো চাষের কাজ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাববার আছে। আপন-পর ভুলে গিয়ে চাষীরা যাতে গ্রামের ফসলের উন্নতির জন্যে সবাই মিলে চেষ্টা করেন গ্রামের সমাজের সেই দিকেই নজর দিতে হবে।

(চ) খেলাধূলায় উৎসাহ

আমাদের জীবনে খেলাধূলার মূল্য যে কত তা আমরা অনেকেই বুঝিনা। গ্রামের যারা ভাল ছেলে তারা শুধু বই মুখস্থ করাটাকেই একমাত্র কাজ বলে ধরে নেয়। কড়া অভিভাবকদেরও মত তাই। কিন্তু এতে পড়াশুনার কাজটা কিছুদিন নিয়মমত চললেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

খোলা মাঠে খেলাধূলার মূল্যত একটা আছেই, তাছাড়া এতে আনন্দও আছে প্রচুর। মনের আনন্দ ওযুধের চাইতে বেশি কাজ করে। বিকেলে খানিকক্ষণ ছুটোছুটি, হৈ হল্লা করে তারা যখন কাজ করতে বসে তখন তাদের পড়াটা ভাল লাগে। অবিশ্যি বেশি পরিশ্রম করা সব সময়ই খারাপ। তাতে সন্ধ্যের পর শরীর খুব দুর্বল মনে হয়।

তাছাড়া গ্রামের সমাজের দিক থেকে এই সব খেলাধূলার ব্যবস্থা একান্ত দরকার। বিকেলে খেলার মাঠে ছেলে-বুড়ো সবাই যাবে। এমন কি মেয়েদেরও বিকেলে খানিকক্ষণ খোলা মাঠে যাওয়ার সুবিধে দেওয়া উচিত। এক একদিন আলাদা-আলাদা দলের সঙ্গে খেলা হবে। শেষদিনের খেলায় যারা জিতবে তাদের কাপ্ বা সিল্ড দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া হবে ভিন্ গাঁয়ের সাথে প্রতিযোগিতা। গ্রামে দুরকম খেলার বন্দোবস্ত করাই সহজ। তার মধ্যে একটা বিদেশী খেলা ফুটবল আর একটা দিশি খেলা হাডু-ডু। অন্য সব বিদেশী খেলায় খরচা বেশি। অবিশ্যি গ্রামের অবস্থানুসারে অন্য খেলাও চলতে পারে।

শহরে যেসব আনন্দের ব্যবস্থা আছে তার অন্ততঃ কয়েকটাও যদি গ্রামে না থাকে তাহলে গ্রামের লোক বাঁচবে কি করে ?

শুধু ইস্কুলের ছেলেরা কেন ? যাদের সারাদিন অন্য কোন ভাবে শরীর খাটাতে হয় না তাদেরও এই ধরণের একটু খেলাধূলা করা ভাল। যাদের বয়স বেশি তারা খোলা মাঠে বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে আসবেন। বয়স্কদের পক্ষে হিঙে-দাঁড়ি খেলা খানিকটা চলতে পারে। তাদের পক্ষে ব্যাড্‌মিণ্টন্‌ খেলা সব চাইতে ভাল।

যেখানে নৌকার অভাব নেই সেখানে খোলা নৌকায় ভেসে বেড়ালেও খুব আনন্দ পাওয়া যায়।

তাছাড়া আছে সাঁতার। সাঁতারও খুব ভাল ব্যায়াম। বড় বড় পুকুরে মাঝে মাঝে সাঁতারের প্রতিযোগিতা হতে পারে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এই সাঁতার দেখ্‌তে যেতে পারে। অবিশ্যি অনেকে বলবেন গেরস্ত ঘরের মেয়েদের অত সময় কোথায় ? আর বয়স্ক লোকেরা কাজই করবে না সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখবে ? আমার উত্তর হচ্ছে আসলে ঐটুকু সময় করে নেওয়া শক্ত নয়। সাঁতারে উৎসাহ দিতে হলেও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সব কাজের জন্যেও আলাদা আলাদা সমিতি থাক্‌বে। সকল সমিতিই নিজেদের কাজ দেখবার চেষ্টা করবে। তাতেই এগুলো হয়ে উঠ্‌বে আনন্দের বিষয়।

অনেকে হয়ত বলবেন খেলার মাঠের অভাব গ্রামে খুব বেশি খেলা ধূলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। গ্রামে খোলা মাঠের অভাব নেই, কিন্তু খেলার মাঠের অভাব আছে। যেখানে খেলার মাঠ বলে একটা কিছু আছে, তা এতই ছোট যে তাতে

বেশি খেলা বা ফুটবলের মত বড় রকমের খেলার বন্দোবস্ত করাই যায় না।

আমি বলব এতেই হবে গ্রামের সমাজের পরীক্ষা। যে করেই হোক্ খেলার মাঠ একটা চাইই। ছোট যে মাঠটি আছে তার আশে-পাশের জমির মালিকদের খানিকটা করে জমি ছেড়ে দিতে হবে। মালিকদের সেটা এমনিতে ছেড়ে দিতে অসুবিধা হলে কিছু দাম ধরে দিয়ে কিংবা অন্য জায়গায় এই পরিমাণের খানিকটা জমি তাদের ছেড়ে দিলেই গোল মিটে যাবে। গ্রামে কেউ কারুর জমি ছেড়ে দিতে চায় না তা জানি। সাধারণতঃ জমিদার শ্রেণীর লোকেরাই এই রকমের জমি দান করে থাকেন। অবিশ্যি তাঁরা পারেন বলেই করেন। আগে দেখেছি জমিদাররা জায়গাটা দিতেন। আর সরকারী খরচায় সেটা ভরাট্ করে চৌরস করে খেলার মাঠ তৈরী করা হত। এখনো ইস্কুলের মাঠের জন্য সরকার এই ধরণের সাহায্য করে থাকেন। তবে সরকার সাধারণতঃ জমিটা কিনে দেন না। এ বিষয়ে গ্রামের সমাজকেই স্বার্থত্যাগ করতে হয়।

দশের মঙ্গলের জন্য যদি দু' একজনকে এই রকম একটু আধটু জমি ছেড়ে দিতে হয়, ভাল অবস্থার লোক হলেত তাঁর আপত্তি করা উচিত নয়। আর তাঁদের যদি তেমন সঙ্গতি না থাকে তা হলে সমাজের লোকদের চাঁদা তুলে হক বা অন্য জমি ছেড়ে দিয়ে হক্ ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া উচিত। এতেই বোঝা যাবে একটা গ্রামের লোক কত উন্নত। জমি জোগাড় করতে যত কষ্টই হোক্ না কেন গ্রামের সমাজের হাল ছাড়লে চলবে না। তাঁরা তাঁদের গ্রামকে কতটা ভালবাসেন এতেই হবে তার পরীক্ষা।

(ছ) হাতের কাজ

এতক্ষণ খেলার কথা হল। এবারে একটু কাজের কথা বলি। গ্রামে অনেক রকমের হাতে তৈরী জিনিষ আছে যা শুধু গ্রামের কেন সহরের লোকেরও বেশ কাজে লাগে। এই সব জিনিষ বাঁশ, বেত বা পাটের তৈরী। বাঁশের তৈরী ডালা, কুলো, বাঁশ এবং বেতের তৈরী মোড়া, চেয়ার, টেবিল ; পাটের তৈরী সিকে, দড়ি এই রকম অনেক জিনিষ গ্রামের লোকেরা তৈরী করতে জানে। তাছাড়া আছে কাঠের পুতুল, মাটির তৈরী খেলনা, তাঁতের কাপড় এবং আরও কত কি !

এসব জিনিষ যারা তৈরী করে তারা উপযুক্ত মজুরী পায় না। সেই জন্যেই দিনের পর দিন তাদের তৈরী করবার উৎসাহ কমতে থাকে। ভাল দামে যাতে এই সব লোক এগুলো বেচতে পারে তার জন্যে গ্রামের সমাজের চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র মেলায় এবং পুজোর সময় হাটে এই ধরণের জিনিষ বেশী বিক্রী হয়। অন্য সময় হয় তারা এগুলো বেচতে পারে না নয়ত খুব সস্তায় তাদের এগুলা ছেড়ে দিতে হয়।

আজকাল সরকার এই সব কুটির শিল্পের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিয়েছেন এবং এগুলো বিক্রীর জন্যে খানিকটা খানিকটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তবু গ্রামের সমাজ এসব জিনিষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করবেন না। তাছাড়া গ্রামের ঘর বাড়ি সাজাবার জন্যেও এরকম কত জিনিষ ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়ির মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করেন, তাদের বসবার জন্যে একটা করে মোড়া তৈরী করিয়ে নিলে

দোষ কি ? আর বেটাছেলে যাঁরা সারাদিন কাজ কর্ম করেন, তাঁরা শুধু দাওয়ায় বসেই বিশ্রাম করবেন কেন ? সকল বাড়িতেই আরাম করে বসবার মত একটা দুটো জিনিষ থাকা উচিত।

সমাজের লোকেরা অনেক রকমের বাজে খরচ করেন। তা না করে এই রকম গ্রামের তৈরী দুটো একটা জিনিষ তাঁরা যদি কেনেন গরিব লোকগুলো বেঁচে যায়।

যারা রোগে ভুগে দুর্বল, যারা আতুর, যারা পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না গ্রামের সমাজ এই সব লোকদেরই বিশেষ করে এই কাজে লাগিয়ে দেবেন। তাতে এই সব লোকের বাঁচবার একটা উপায় হবে। গ্রামে ভিখিরী বেড়ে যাওয়া গ্রামের অসম্মান এ কথা যেন সমাজের লোকেরা কখনো না ভোলেন।

এ সব জিনিষ ভাল করে তৈরী করার জন্যেও ছোটখাট পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে।

গ্রামের তাঁতীদের তৈরী জিনিষ ত সবাই ব্যবহার করতে পারেন। সস্তা হবে মনে করে তাঁরা যে সব মিলের কাপড় কেনেন তা অত্যন্ত খেলো ধরণের—একেবারেই টেঁকে না। অথচ কিনতে গেলে কম পয়সায় কেনা যায় বলে সবাই তার পিছনেই ছোটে। গ্রামের তাঁতী খেতে পায় না তবু সবাই ভিন্ গাঁয়ের তাঁতীর তৈরী গামছা কিনে থাকেন। নিজেদের গ্রামের যে কাপড় বা গামছা তৈরী হয় গ্রামের লোকের সেই-গুলোই কেনা উচিত।

যারা তৈরী করবে তাদেরও তেমনি বুঝে সুঝেই দামটা হাঁকা উচিত। আশে-পাশের হাটে-বাজারে এগুলো যে দামে বিক্রী হয়, গ্রামের লোকের কাছে তার চাইতে বেশি দাম চাওয়া চলে

না। গ্রামের লোক হলেও বেশি দাম তাঁরা দিতে চাইবেন কেন ? সকলেরই অভাব অভিযোগ আছে। গ্রামে খুব ভাল অবস্থার কটা লোকই বা থাকে ! কাজেই কারুরই নিজের কথা বেশি ভাবলে চলবে না।

এই ভাবে উদার মন নিয়ে গ্রামের সবাইকেই চলতে হবে। সবাই ভাববেন কেউ চিরকালের জন্যে এখানে আসেননি। সময় হলেই যখন চলে যেতে হয় তখন 'আমার', আমার' বলে কানাকড়ি নিয়ে টানাটানি হানাহানি করে লাভ কি ? যে কদিন থাকা সে কদিন যাতে শান্তিতে এবং অনায়াসে থাকা যায়, পরের মঙ্গল, দেশের একটুখানি ভাল যাতে সবই করে যেতে পারেন তাই করবেন। তা না হলে ঠিক্ মানুষের মত ত বাঁচা হয় না।

(জ) গ্রামের নানা রকমের আনন্দ

আমি আগেই বলেছি মানুষের জীবনে আনন্দ থাকা চাই। খেলাধূলায় যোগ দিয়ে কিংবা খেলা দেখে খুব আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রামের সবটুকু আনন্দ নয়। শহরে এত সিনেমা, এত নাচ, গান, প্রদর্শনী বা একজিবিসন্ ! আর গ্রামে কিছুই থাকতে নেই ? গ্রামের লোকও ত মানুষ ; তাঁরাও ত' মানুষের মত বাঁচতে চায়। শহরের দিকে চেয়ে বসে থাক্‌লে তাদের চ'লবে কি ক'রে ? আর শহরে গিয়ে এগুলো দেখে আসার সুবিধে কজনেরই বা হয় ? আর হলেও রোজই ত আর তা হতে পারে না ! তাই গ্রামে এই ধরনের কিছু কিছু আনন্দের আয়োজন থাকা চাই।

গ্রামে কখনো কখনো এমন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায় যারা পালা বাঁধতে পারেন। কেউবা না তৈরা করতে পারেন। তাঁরা গ্রামের লোকদের আনন্দ দেবার জন্যে নিজেদের এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন। যে গ্রামে এরকম লোক একেবারেই নেই সেখানে যে কোন যাত্রার বই জোগাড় করে মাঝে মাঝে যাত্রার আয়োজন করতে পারেন। এই জন্যে চাঁদা তুলে কাজ-চালানো গোছের কিছু পোষাক, কয়েক রকমের বাজনা—এই সমস্ত আস্তে আস্তে করে নিতে হবে।

যাত্রার কথাটাই আমি আগে বলছি, তার কারণ গ্রামের লোকের মনে আনন্দ দেবার পক্ষে যাত্রা ভারী সুন্দর জিনিষ। অবশ্যি থিয়েটারও মাঝে মাঝে হবে, তবে যাত্রার আয়োজন করাই সহজ। কিছুদিন খুব ভাল ভাবে চেষ্টা না করলে থিয়েটার নামানো যায় না। আর তাতে খরচাও অনেক। কোন পূজো বা উৎসবের সময়েই থিয়েটার করা চলবে।

কীর্তন গ্রামে খুবই হয় তবু বেশ বড় একটা জায়গা ঠিক্ করে নিয়ে গ্রামের সকল লোকের শোনবার মত করে করতে হবে। এরকম কীর্তন গান দুচার দিন বাদে বাদেই হওয়া চাই। তাছাড়া মাঝে মাঝে কথাবার্তার ব্যবস্থাও হবে।

কবি গানেরও ব্যবস্থা থাক্‌বে। অবশ্য ভাল কবির দল খুব কমই পাওয়া যায়। তবে কীর্তন, যাত্রা, সখের থিয়েটার গ্রামের লোকেরাই কর্‌তে পারেন।

গানের আসরও মাঝে মাঝে হবে। কখনো নিজেদের গ্রামের লোকেরাই এই সব গান গাইবেন। কখনো কখনো ভিন্ গাঁয়ের গাইয়েরাও আসবেন। আবার এ গ্রামের লোকেরাও পাশের

গ্রামের গানের জল্‌সায় যোগ দেবেন। এতে পাশের গ্রামের লোকদের সঙ্গেও ভাব থাকবে। নিজেদের গ্রামের ছেলেদের এবং সম্ভব হলে মেয়েদেরও গান গাওয়ায় উৎসাহ দিতে হবে। এতেও পুরস্কার ও মেডেল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বলা এবং হাস্যকৌতুক বা কেরিকেচারেরও ব্যবস্থা মাঝে মাঝে কর্‌তে পারলে ভাল হয়।

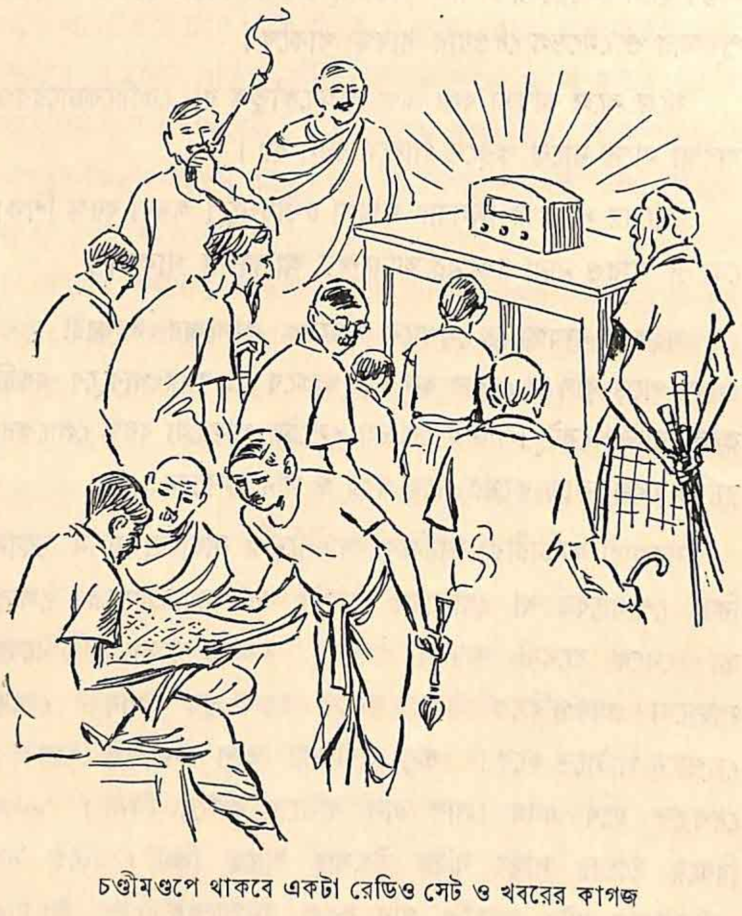
গ্রামের সকলের মিলবার জায়গা চণ্ডীমণ্ডপে অথবা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আরও নানা রকমের আনন্দের আয়োজন থাক্‌বে।

সরকারী ব্যবস্থামত সেখানে খবরের কাগজের দরকারী কথা গুলো পড়ে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আর থাক্‌বে একটি করে রেডিও সেট্। এই রেডিও সেটের সাহায্যে বয়স্ক লোকেরা রাত্তির বেলা কাজ কর্মের পরে খবর ও গান শুন্‌বেন।

সরকারী কর্মচারীরা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে যখন কোন কিছু শোনাবেন বা বোঝাবার চেষ্টা করবেন, গ্রামের লোক তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাবে। অবশ্যি এসব জিনিষের সাহায্যে গ্রামগুলিকে উন্নত করতে হলে খুব উপযুক্ত লোক সেখানে পাটাতে হবে। শুধু পরীক্ষায় ভাল করলেই হবেনা। দেখ্‌তে হবে এসব লোক ভাল বলিয়ে কইয়ে কিনা। এসব বিষয়ে তাঁদের সত্যি সত্যি উৎসাহ আছে কিনা। এই সব কর্মচারীদের নাটক, আবৃত্তি, গান সকল ব্যাপারেই বেশ উৎসাহ থাকা দরকার। মিইয়ে পড়া গ্রামের লোকদের সজাগ ও সজীব করে তোলা বড় সহজ কাজ নয়।

এই সব আনন্দের ভিতর দিয়ে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের

সঙ্গে প্রত্যেকটি লোকের মেলামেসা ঘট্‌বে। তাদের মধ্যে একটা ভালবাসা জন্মাবে।



চণ্ডীমণ্ডপে থাকবে একটা রেডিও সেট ও খবরের কাগজ

যখন এইভাবে সকলে সকলের সঙ্গে মিসবে, সকলে সকলের কথা ভাব্‌বে, একে অপরের দুঃখের অংশ নেবে, সুখে আনন্দ করবে, তখন গ্রামেই নেমে আসবে স্বর্গ।

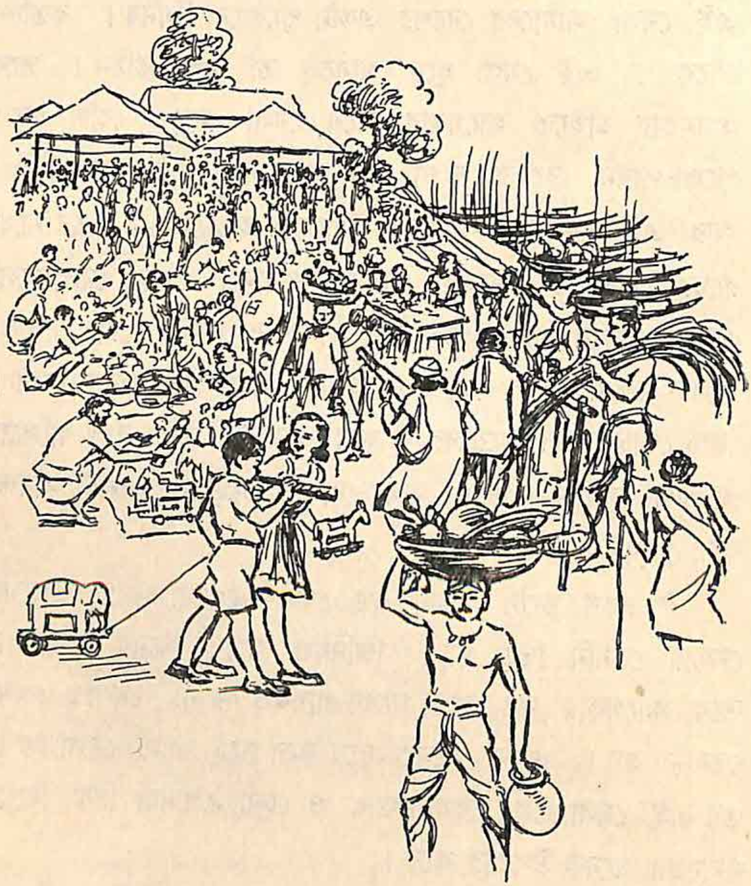
(ঝ) মেলা ও পূজো-পার্ব্বন

মেলা গ্রামের সমাজের মেলা মেসার একটা বড় উপায়। এই মেলা আমাদের দেশের একটা পুরোনো জিনিষ। কতদিন থেকে যে এই মেলা হয়ে আস্ছে তা বলা কঠিন। তবে এখনকার চাইতে আগেকার দিনে মেলা আরও বেশি হত। পূজো-পার্বন, ব্রতের সংখ্যা তখনকার দিনে আরও বেশি ছিল। আর এই সব পাল-পার্বনের উপলক্ষে হত মেলা। এর মধ্যে রথের মেলা ও চড়কের মেলাই প্রধান। এই মেলাগুলো গ্রামের জীবনে এনে দিত একটা আনন্দের ঢেউ। রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রনা ভুলে এই একটি দিন সবাই খুব আনন্দ করত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ত কথাই নেই। তারা বাঁশী বাজিয়ে জিলিপি, ফুলুরি খেয়ে, নাগর-দোলায় চড়ে সারাদিনই আনন্দ করে বেড়াত।

ঐ রকম দুটো একটা বড় মেলা এখনো হয়। এখনো মেলায় তেমনি ভিড় হয়। জিনিষও আসে অনেক রকমের। তবে আগেকার মত অত পূজো-পার্বনও হয় না, মেলাও এখন তেমনি কম। এখন অনেক দূরে দূরে দুটো একটা মেলা হয়। তবু এই মেলাগুলো দেখাসাক্ষাৎ ও চেনা শোনার দিক দিয়ে সমাজের অনেক উপকার করে।

এই মেলায় গ্রামের লোকের তৈরি নানা জিনিষ আসে। যারা হাতের কাজ করে, তারা এই সময় বেশ খানিকটা পয়সা রোজগার করে নেয়। কারণ মেলায় গেলে কিছু কিনতেই হয়। অনেক রকমের মসলা, খেলনা আর খাবার এই মেলায় পাওয়া যায়।

দু'-একদিন আগে থেকেই জিনিষ পত্র আস্‌তে থাকে। আর মেলার দিন সকালবেলা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা এগারোটা অবধি এই মেলার হৈ চৈ চলে।



মেলা

এইভাবে মেলা গ্রামের জীবনে একদিনের জন্যে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। মাল চেনাচেনি, দরজানাজানি করে কত লোক কত জিনিষ নিয়ে ঘরে ফেরে। ভিন্ গাঁয়ের লোকদের

সঙ্গে এই মেলা উপলক্ষে হয় সাক্ষাৎ। আত্মিয়-স্বজনও এই মেলা উপলক্ষ করে সেই গ্রামে এসে জড় হয়। একদিন আনন্দ করে তারা বাড়ি ফিরে নিজের নিজের কাজে মন দেয়। এইভাবে সকলের সঙ্গে হয় একটা মেলা মেশা।

তাই সমাজের দিক থেকে মেলার মূল্য খুব বেশি। গ্রামে যত মেলা বসান যায় ততই ভাল। এতে গ্রামের সমাজে আবার আনন্দ ফিরে আসবে। লোক পাগলের মত সহরমুখো হবে না। নিজের গ্রামকে ভালবাসতে শিখবে এবং গ্রামের সমাজের লোকদের মধ্যেও গড়ে উঠবে একটা ভালবাসার সম্বন্ধ। তাই গ্রামের সমাজ চেষ্টা করে এই সব মেলা বসাবেন। পূজো-পার্বন থাকলেই গ্রামে একটা করে মেলা বসবে। এতে নানা দিক দিয়ে দেশের উপকার হবে।

এই মেলায় যুবক-দলের কর্তব্য হবে শান্তি রক্ষা করা। কেউবা বন্দোবস্ত করবে খাবার জলের। কেউ বা নিযুক্ত থাকবে দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে। এইভাবে গ্রামের ছেলেরা শিখবে সমাজসেবা।

পূজো-পার্বনেও গ্রামের যুবকরা এই ভাবে সমাজের সেবা করবে। ছোট বড়, ধনী গরিব সকলকেই তারা ভালবাসতে শিখবে। তারা আপন-পর বিচার করবে না। সকলকেই সমান চোখে দেখ্‌বে। এইভাবেই তারা সমাজ সেবা শিখবে। সমাজ সেবাই সব চাইতে বড় ধর্ম।

(ঞ) চুরি বন্ধ করা ও চলাফেরা এবং কাজ-কর্মে ঠিক্‌মত চলতে শেখা

প্রায় সকল গ্রামেই চুরি হয়। ধান চুরি, গরু চুরি, টাকা পয়সা চুরি হয় না এমন গ্রাম খুব কমই আছে। থানা, পুলিশের পক্ষেও সকল সময় এই সব চুরি বন্ধকরা সম্ভব হয় না। এসকল চুরি গ্রামের লোকের একটা বড় রকমের অশান্তির কারণ।

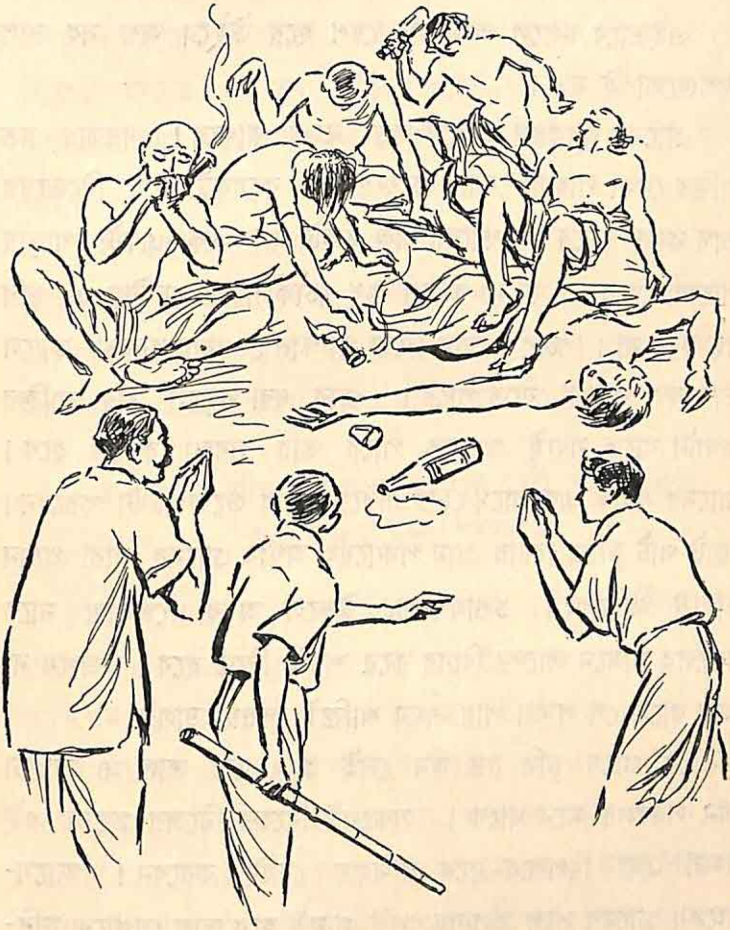
সুতরাং গ্রামের লোকের ভালর জন্য গ্রামের সমাজকে এই কাজে হাত দিতে হবে। মাঝে মাঝে সভায় গ্রামের লোক-দের ডেকে এই চুরির নিন্দে করতে হবে। খেটে খাওয়ার যে মান বেশি, টাকা কড়ি যে দুদিনের জন্যে এই সব তাদের বোঝাতে হবে। তাদের মধ্যেই যে চোর আছে এবং কোন রকমে জানতে পারলে তাকে যে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে একথা মাঝে মাঝে তাদের শুনিয়ে দিতে হবে।

চুরি ডাকাতি বন্ধ করবার জন্যে নেশার আড্ডাগুলোকেও ভাঙতে হবে। নেশার আড্ডায়ই এই সব চুরির পরামর্শ হয় এবং এই নেশাই চুরির সাহস জোগায়।

এরই সঙ্গে আস্‌ছে গ্রামের লোকের চলাফেরার কথা। গ্রামের লোক ঠিক্ ঠিক্ মত চলা ফেরা করেনা। কেউ কারুর কথা শোনেনা। যাঁরা বয়সে বড় তাঁদেরও অনেক সময় অপমান ও ঠেলা ধাক্কা সইতে হয়। এর কারণ এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা নেই।

গ্রামের ডাকঘরে পোষ্টকার্ড কিন্‌তে, টিউবওয়েলে জল নিতে, কিংবা হাটে বাজারে জিনিষ কিন্‌তে লোককে কত নাকালই না

হতে হয়! একটু ভিড় হলে মেয়েদের চলা ফেরাতেও কতই না অসুবিধে হয়। কাজেই গ্রামের লোকদের মেয়েদের আরও



নেশার আড্ডাগুলোকে ভাঙতে হবে

সম্মান করতে শেখাতে হবে। বুড়োদের এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাজের সুবিধে করে দিতে কেউ যেন ত্রুটী না করেন।

লাইন করে দাঁড়িয়ে পরের পর একটা কিছু নেওয়া ত খুব ভাল অভ্যেস। তার মধ্যেও বুড়োদের এবং ছোট ছেলেদের এগিয়ে যাওয়ার স্থবিধে দিতে হবে।

এইভাবে চললে আমাদের দেশ হয়ে উঠ্‌বে অন্য সব ভাল দেশগুলোরই মত।

গ্রামের যুবকদল এদিকে কড়া নজর রাখবে। দরকার মত রাত্তির বেলা পাহারা দেবার জন্যেও তারা কয়েকটা দলে নিজেদের ভাগ করে নেবে। তাদের এক একটা দল এক একটা পাড়ায় পাহারা দেবে। তা না করলে শুধু চৌকীদারের চেষ্টায় এ চুরি বন্ধ হবে না। চোর ধরবার জন্যে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। চোর ধরা পড়লে তার শাস্তির কথাটা যাতে সবাই জান্‌তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সবাই একযোগে চোর ধরিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করবেন। ছোট খাট চুরির বিচার গ্রাম পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ গ্রামের যারা প্রধান তারাই করবেন। চণ্ডীমণ্ডপে, ইস্কুলে অথবা খেলার মাঠে সকলের সামনে তাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। জখম না করে যাতে সে লজ্জা পায় এমন শাস্তিই দেওয়া ভাল।

যে গ্রামে চুরি যত কম সেই গ্রাম তত ভাল এ কথাটা যেন সকলের মনে থাকে। সকলেই নিজের নিজের গ্রামের এই লজ্জা এবং বিপদকে দূরে রাখবার চেষ্টা করবেন। আসে-পাসের গ্রামের সঙ্গে তুলনায় সেই গ্রামই হবে ভাল যেখানে চুরি-ডাকাতি নেই।

ডাকাতি বড় সর্বনেশে জিনিষ। ডাকাতি অবশ্যি সকল সময় হয় না। তবে হলে হঠাৎ হয়। বাড়ির লোক ত বাধা

দিতে পারেই না। গ্রামের লোক ছুটোছুটি করে বেরুবার আগেই তারা সরে পড়ে। তবে একটা কথা অবশ্যি স্বীকার করতে হবে যে ভিন্ গাঁয়ের লোকও যদি ডাকাতি করে গ্রামের লোকের সাহায্যেই তারা এই ডাকাতি করে থাকে। সেই জন্যেই গ্রামের এই সব লোকের যাতে জ্ঞান হয়, তারা যাতে নিজের গ্রামের ভাল কিসে হয় তা বুঝতে পারে সেই চেষ্টা করতে হবে।

এই জন্যেই গ্রামের বেকার এবং খারাপ লোকদের কাজ দিতে হবে। তারা যদি একটা কিছু করে এবং যদি কিছু রোজগার করতে পারে তা হলে তাদের মনটা চুরি ডাকাতির দিকে যাবে না এটা আশা করা যেতে পারে।

(ট) বিয়ে, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য উৎসবে বেশী খরচা এবং অনেকগুলা গয়না ব্যবহার

গ্রামের সাধারণ লোকের টাকা পয়সা বেশি নেই। কিন্তু এরই মধ্যে যাদের কিছু আছে, কিংবা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, তাঁদের একটু পায়া ভারী হয়। তাঁরা মনে করেন তাঁদের ওজন বেড়েছে। এইটে প্রমাণ করবার জন্যে তারা বিয়েতে বা শ্রাদ্ধে বেশি খরচ করতে গিয়ে অনেক সময় দেনাও করে ফেলেন। আমার যদি গ্রামের সকল লোককে খাওয়াবার মত পয়সা না থাকে তা হলে একটা করে মিষ্টি আর পান দিয়েও ত আমি সমাজের লোকের সমাদর করতে পারি? আমার তেমন পয়সা না থাকলেও আমাকে মাংস, পোলাও কিংবা লুচি খাওয়াতে হবে এমন কথা কে বলছে? আর যদি কেউ বলে থাকে তা

আমি শুনব কেন ? কেউ যদি টাকার বা ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাতে চায় দেখাক্। আমার যেমন অবস্থা আমি তেমনি চলব। ঋণ করে সমাজের লোকের কাছে বাহাদুরি নেব এর চাইতে বোকামি আর কি হতে পারে ? একদিন বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে যে আমাকে জীবন ভর তার ঠেলা সাম্‌লাতে হবে ! তখন কি গ্রামের লোক আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না তাতে মানই বাঁচবে ?

তাছাড়া বাপ-মা বেঁচে থাকতে তাদের সেবা না করে, তাঁদের খোঁজ খবর না নিয়ে, কিংবা চিকিৎসা না করিয়ে, মরবার পর 'দান সাগর' শ্রাদ্ধ করবার কোন মানে হয় না।

সুতরাং আমার পয়সায় সহজে যতটা কুলিয়ে যায় আমি তাই করব এতে যে যা মনে করে করুক। পাছে লোকে কিছু বলে —এই ভয়ে কত লোক যে বিপদে পড়ে তার সীমা সংখ্যা নেই। কাজেই এ ভুল যেন কেউ না করেন। সমাজের কর্তারা সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

কিন্তু এতে যেন কেউ না মনে করেন যে নেমন্তন্ন এবং ফলার গ্রাম থেকে একেবারে উঠে যাবে।

যাদের পয়সা আছে তাঁরা এই সব বিয়ে এবং শ্রাদ্ধে গ্রামের লোকদের পেটপুরে খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন। গ্রামের সাধারণ লোক, গরীব দুঃখী, কাঙাল সবাই এই সব বড় লোকের বাড়িতে ভাল মন্দ খেয়ে মুখ বদ্‌লাবে এবং আনন্দ পাবে। এতে তাদের পয়সার একটা উপযুক্ত ব্যবহার হবে। গ্রামের ছেলেরাও সব খাটবে এবং আনন্দ করবে।

এই সমস্ত ধনীর বাড়িতে আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক

লোক জড় হবে। আবার মিল্‌বে সকলের সঙ্গে একটা মেলা মেশার সুযোগ। সমাজের দিক থেকে এরও যথেষ্ট মূল্য আছে। এইভাবে ভিন্ গাঁয়ের লোকের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাবে। তা ছাড়া একই গ্রামের লোকের মধ্যে ত চেনা-জানা, আলাপ পরিচয় ঘটবেই।

এঁরা পূজো-পার্বনও খুব ঘটা করে করবেন। গ্রামের গরীব দুঃখীরা দু'-একদিন খেয়ে বাঁচবে। আর তা ছাড়া এতে গ্রামে একটা আনন্দের সাড়া পড়বে। সবাই ভাববে আমাদের গ্রামেও ত আনন্দ কম নেই ?

এরি সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। সেটা হচ্ছে গয়নার কথা। এখনো গ্রামের অনেক মেয়েরা ভারী গয়না পরেন। গয়না করলে যে টাকা জমানোই হয় এবং তাতে ইজ্জত বাড়ে একথা আমি মানি। কিন্তু এই গয়নাগুলোর জন্যেই অনেক সময় চুরি-ডাকাতি হয়। কাজেই টাকা জমাবার পক্ষে এটা খুব ভাল উপায় নয়। টাকাটাকে অন্যভাবে খাটালেই বরং ভাল। তা ছাড়া অতগুলো গয়না নিয়ে চলাফেরা করাও মুস্কিল; অবশ্যি গয়না একেবারে না থাকলে মেয়েদের ভাল দেখায় না। কাজেই পারলেও কেউ গয়না ব্যবহার করবেন না একথা আমি বলিনা। তবে যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

গয়না ব্যবহার করতে করতে ক্ষয়েও যায়। ক্ষয়ে গেলেই তার দাম কমে গেল। অথচ টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখ্‌লে অথবা তা দিয়ে ন্যাশ্‌ন্যাল সেভিং সার্টিফিকেট, প্ল্যান লোন সার্টিফিকেট, বা ট্রেজারি সেভিং সার্টিফিকেট কিনলে ঢের সুদ পাওয়া যায়। টাকাটাও বেশ নিরাপদে থাকে। তাছাড়া ব্যবসায়েও এর খানিকটা টাকা খাটালে লাভ দাঁড়াতে পারে।

কাজেই এই গয়নার বিষয়টা গ্রামের সমাজের ভেবে দেখা দরকার। এতে লোকের টাকাটা ত বেঁচে যাবেই এমনকি দিন দিন বেড়ে চলবে।

(ঠ) শেষ কথা

শেষ কথা বলে একটা কিছু বলতে হয় তাই বলা। এ সম্বন্ধে আমার যা বলবার ছিল অল্পকথায় তা বলবার চেষ্টা করেছি।

আরেকবার শুধু দেশের লোক ও গ্রামের সমাজকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে গ্রামের এবং দেশের উন্নতির মূলে একটি জিনিষই আছে। সেটি হচ্ছে ভালবাসা। শাসনে যা না হয় ভালবাসা দিয়ে তা পাওয়া যায়। মুরুব্বিয়ানা না ফলিয়ে ভদ্র-ভাবে আদর করে একটা লোককে দিয়ে একটা কিছু করাবার চেষ্টা করুন দেখবেন সে কাজটি কত সহজে হয়ে যায়।

এ সংসারে মিষ্টি কথা ও ভাল ব্যবহারের মূল্য অনেক। ছোট বড় সবাই এই ব্যবহারে খুশী হয়। এর দ্বারা সহজে কাজ হাসিল করা যায়।

সেই জন্যই সবাইকে ভালবাস্‌ব এইটিই হল সমাজ সেবার প্রথম এবং শেষ কথা। আমরা একে অন্যকে ভালবাসতে পারিনা বলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। যা কিছু করব বলে মনে করি সেগুলো সবই ভেস্তে যায়।

গ্রামের লোক হিসেবে যদি সবাই সবাইকে ভালবাস্‌তে শেখে তাহলেই আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে। আমরা মানুষ হব।

সহজবোধ্য কয়েকখানি বই

শরীর ভাল রাখতে হলে

পুরাণ-কথা

গ্রামের সমাজ

মোরগ ও মুরগী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড